প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন

যুথিকা বড়ুয়া

রক্তের সম্পর্ক সবচে’ বড় সম্পর্ক। আপনজন যত দূরেই থাকুক, সম্পর্ক চিরকাল অটুট থাকে! কখনো ছিন্ন হয়না! আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্নভাবে থাকার কারণে সম্পর্কের গভীরতা ক্রমশ কমে আসে! আগের মতো টানও থাকেনা! তদ্রুপ অনাত্মিয়া, অজানা অপরিচিত মানুষের সাথে অগাধ মেলামেশায় এবং উদয়াস্থ মুখদর্শণে সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠাও স্বাভাবিক! যার সূত্র ধরে অচীরেই জন্ম নেয়, ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-মমতা আর ভালোবাসা। যে ভালোবাসায় কোনো স্বার্থ নেই! কোনো চাহিদা নেই! নেই কোনো ঈর্ষা, ক্রোধ, মান-অভিমান, অনুযোগ ও অভিযোগ। যার সঙ্গে রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই!

যেমন আমাদের প্রতিবেশী পারুলের সঙ্গে মাত্র দু’দিনের আলাপচারিতায় গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব! পারুল খুবই মিশুকে এবং মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে! কথায় কথায় হাসে! প্রথম দর্শণেই আবেগাপ্লুত হয়ে সহৃদয়ে এমন অমায়িকভাবে আমায় ‘দিদি’ বলে সম্বোধন করল, যেন ও’ আমার কতদিনের চেনা, কত আপনজন! বহু দিনের সম্পর্ক ওর সঙ্গে।

প্রবাস জীবনে শতব্যস্ততার মধ্যেও অবসর সময়ে আমাদের কথা হতো টেলিফোনের মাধ্যমে। গল্প করতো মিডলইষ্টের। শুনতাম, জানা দেশের অজানা কথা! কিন্তু দিদি বলে ডাকলেই আবেগাপ্লুত হয়ে মুহূর্ত্যেই কোমল হৃদয়টা আমার গহীন মমতায় ভরে গিয়ে মনশ্চক্ষে ভেসে উঠতো, আমার ছোট্টবোন মিনুর গোলাপ গালের তুলতুলে নরম সেই মুখখানা! হারিয়ে যেতাম কৈশোরের হাজার মায়া জড়ানো সোনাঝরা দিনের অম্লান স্মৃতির মণিমেলায়। যখন উন্মুক্ত নীল সামিয়ানার নীচে স্নিগ্ধ সবুজ ঘাসের প’রে কিংবা প্রস্ফূটিত লাল-নীল-হলদে-বেগুনী ফুলের বিকশিত পাঁপড়িগুলিতে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে বসা রং-বেররংএর ফড়িং, প্রজাপতি দেখলেই মিনু উর্দ্ধঃশ্বাসে ছুটে যেতো ওদের দুহাতে জড়িয়ে ধরতে! ততক্ষণে বুদ্ধিরচাতুর্য্যে ওরা চোখের পলকে ওকে ফাঁকি দিয়ে ফুরুত করে উড়ে পালাতো। মিনুও মরিয়া হয়ে ছুটতো ওদের পিছু পিছু। আর ধরতে না পারার চরম ব্যর্থতায় ঠোঁট ফুলিয়ে হাতের আঙ্গুল কাঁমড়ে ধরে, পা-দু’টো ব্যাঁকা করে অশ্রুসজল চোখে এমন করুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকতো, বুকটা চকিতে মোচড় দিয়ে উঠলেও পেটে খিল ধরে যাওয়া উন্মুক্ত হাসি চেপে রাখা যেতোনা। মিনু অপমানে ভ্যাঁ করে জোরে কেঁদে উঠতো! তখন ওকে শান্ত করতে গিয়ে বুকের গভীরে জড়িয়ে ধরে ওর কপালে, গালে চুম্বনে চুম্বনে অবুঝ মনটা ওর মুহূর্ত্যেই অনাবিল খুশীতে ভরিয়ে দিতাম। আর তক্ষুণিই ওর আঁধার ম্লান মুখে হাসির ঝিলিক দিতে দিতে খিল্‌খিল শব্দে বয়ে যেতো হাসির ঝর্ণা।

হঠাৎ একদিন পারুল সপরিবাওে দেশান্তর হচ্ছে শুনে মেঘের আড়ালে সূর্য ডুবে যাবার মতো প্রসন্ন মনটা আমার তৎক্ষণাৎ বিষাদে ভরে গেল। ঘনিয়ে এলো বিদায়ের পালা। বিদায় মানেই বিচ্ছেদ! আর বিচ্ছেদ মানেই বেদনা! যা আমার কোমল হৃদয়কে বড্ড বেশী কষ্ট দেয়। কিন্তু কেন? পারুল তো আমার কেউ হয় না! বছর তিনেক আগেও তো ওকে চিনতাম না, জাতাম না। তা’হলে!

হয়তো অদৃশ্য এক বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিলাম বলেই! ওকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম বলেই! তাই চোখের পাতাদুটো সেদিন সারারাত জাগ্রত ছিল! ক্ষণপূর্বের বেদনাময় গহীন অনুভূতিগুলি বারবার আমায় দংশণ করছিল! আর তখনি মনে পড়ে গেল, ঠিক এমনি করেই অদৃশ্য মায়াজ্বালে জড়িয়ে, অশ্রুজলে প্লাবিত করে চিরদিনের মতো বিদায় নিয়ে চলে গিয়ে ছিল আমাদের বুলবুল।

বুলবুল ছোট্ট একটি পাখী। একদিন কোথা থেকে উড়ে এসে আমাদের রান্নাঘরের চালঘেঁষা বিশাল পেঁপে গাছের ডালে বসে থর্‌থর্ করে কাঁপছিল। রক্তে ভিজে যাচ্ছিল ওর গা। কিসে যেন কাঁমড়িয়ে ঘা করে দিয়েছিল। তাড়ালেও যাচ্ছিল না! অবশেষে মিনুর একান্ত পীড়াপীড়িতেই পাখীটাকে আশ্রয় দেওয়া হলো গৃহের এককোণে এবং যথাযথ সেবা-শুশ্রূষায় ও যত্নে দুদিনেই চাঙ্গা হয়ে উঠলো। তখন কি আর ছেড়ে দেওয়া যায়! বুলবুল নামকরণেই রয়ে গেল আমাদের পোষা হয়ে। থাকতো খাঁচার ভিতরে। আর উতলা হয়ে সারাদিন খাঁচা ধরে বসে থাকতো মিনু! বুলবুলকে কখনো একা থাকতে দিতোনা! অথচ নিজে অবোধ শিশু, আর বুলবুল অবলা প্রাণী। সারাক্ষণ ওর সঙ্গে আবোল -তাবোল বকতো। বুলবুলের মা-বাবা কোথায়! হারিয়ে গ্যাছে কি না! ওর মন খারাপ লাগছে কি না! ওর ঠোঁটটা এতো লম্বা কেন! ওর দাঁত নেই কেন! হাজারটা প্রশ্ন মিনুর। বুলবুলও যেন কত বুঝতো ওর কথা! ক্ষণে ক্ষণে পাখনা মেলে নেচে উঠতো আর কানে তালা লাগিয়ে ওর ভাষায় কর্কশ কন্ঠে গেয়ে উঠতো, 'টিরিট্টি, টিরিট্টি!'

একদিন খাঁচাটা বারান্দার কার্ণিশে ঝুলিয়ে রাখতে গিয়ে মাটিতে পড়ে খাঁচার দরজাটাই বেঁকে যায়! শক্ত তার দিয়ে বেঁধে দেওয়া সত্বেও দরজাটা কিছুতেই আর বন্ধ হতো না! আলগাই থাকতো। ভয় হতো, বুলবুল উড়ে না পালিয়ে যায়! কিন্তু তার পরেও প্রায় ন'মাস প্রভুভক্তের মতোই পোষা হয়ে ছিল! ভাবলাম, আমাদের মতো বুলবুলও বোধহয় মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে! ওদের অন্তরেও মায়া-মমতা -ভালোবাসা আছে! কিন্তু ওযে একটা পশু! মানুষের ভালোবাসা ওরা কখনোই বুঝবে না! যার মূল্য কোনদিনও দিতে পারবে না ওরা! আর সেটাই দৃষ্টান্তসরূপ প্রমাণিত করে, একদিন দিগন্তের প্রান্তরে উষার প্রথম সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো উদ্ভাসিত হবার পূর্বেই বুলবুল কখন যে খাঁচা থেকে বেরিয়ে উড়ে পালিয়ে গেল, আমরা জানতেই পেলাম না কেউ! ভেবেছিলাম, মুক্ত গগনের বিশুদ্ধ বাতাস কিছুক্ষণ উপভোগ করেই ফিরে আসবে নিশ্চয়ই, কিন্তু বুলবুল আর ফিরে আসেনি!

কেঁদে কেঁদে হয়রান মিনু। আমরাও বেদনাহত! কিন্তু কতদিন! দিন যায়, মাস যায়, কেটে যায় বছর। ততদিনে শৈশবের ধূলোবালি ঝেড়ে মিনু কৈশোরে, আমি যৌবনে পৌঁছেই হৃদয়পটভূমি থেকে ক্রমশ একটু একটু করে মুছে যেতে লাগল বুলবুলের স্মৃতি। ওর মতোই বিলুপ্ত হয়ে গেল, মনের গভীরে জমে থাকা রাশি রাশি মায়া-মমতা আর ভালোবাসা।

হয়তো এমনি করেই একদিন পারুলও আমাদের ভুলে যাবে। ভুলে যাবে ঋতুর মতো পরিবর্তিত জীবন যাত্রার অন্তবিহীন পথ চলতে চলতে পিছনে ফেলে আসা মানবপ্রীতির আনন্দময় কিছু স্মৃতি ও ভালোবাসা। যা প্রাত্যাহিক জীবনে আমার স্মৃতির পথে অম্লান পাথেয় হয়ে থাকবে।

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডা প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।
guddi_2003@hotmail.com